জীবনে যা দেখলাম

প্রথম খণ্ড (১৯২২-১৯৫২)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

আত্মজীবনী লেখার
কৈফিয়ত

যাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রেরণা লাভ করা যায়, তাদের জীবনী লেখা হয়ে থাকে। আমি নিজেকে এর যোগ্য মনে করি না বলে আমার জীবনী কেউ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে- এ ধারণা আমার ছিলো না। গত আশির দশকে জামায়াতে ইসলামী আমার নাগরিকত্ব বহাল করার জন্য যখন আন্দোলন করে, তখন ভারতপন্থি বাঙালি জাতীয়তাবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ইসলাম বিরোধী মহল আমার চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে ব্যাপক অপপ্রচার চালায়। সম্ভবত এর মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান 'অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগ্রামী জীবন' শিরোনামে ১৮০ পৃষ্ঠার এক বই এবং এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। ইসলামী আন্দোলনে আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব মুহাম্মদ নুরুয্যামান Prof. Ghulam Azam: A Profile of Struggle in the Cause of Allah শিরোনামে ইংরেজিতে ১৭৬ পৃষ্ঠার আরও একটি বই প্রকাশ করেন। এতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে অব্যাহতি লাভ করার পর ২০০১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি ড. সৈয়দ আলী আহসানের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। তিনি বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় এবং ছাত্রজীবন থেকেই আমি তাঁর স্নেহধন্য। আমার অনূদিত আমপারার অনুবাদ পড়ে খুশি হয়ে তিনি যে মন্তব্য করলেন, তা আমাকে আরও অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমার অব্যাহতিকে তিনি স্বাগত জানালেন এবং এ সুযোগে আমার আত্মজীবনী লেখার জন্য শুধু পরামর্শ নয়; রীতিমতো উদ্বুদ্ধ করলেন। আত্মপ্রচার আমার স্বভাব ও রুচিবিরুদ্ধ। আত্মজীবনী আত্মপ্রচারে পরিণত হয় কিনা, এ বিষয়ে কিছুদিন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাটল। শেষ পর্যন্ত তিনটি কারণে লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তির মধ্যে যারা আমাকে মহব্বত করেন, তারা এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য হয়তো এ থেকে কিছু শিক্ষা বা উপদেশ সংগ্রহ করতে পারেন।

২. জীবনে যা কিছু দেখলাম তা প্রকাশ করা উপলক্ষে এর পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত এমন কিছু শিক্ষামূলক ঘটনা ও উপদেশমূলক বিবরণ পেশ করার সুযোগ পাবো, যা থেকে তারা উপকৃত হতে পারেন।

৩. আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর দীনের যেটুকু আলো দান করেছেন, তা থেকে যতটুকু সম্ভব এ উপলক্ষে পরিবেশন করা সহজ হবে।

২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সাপ্তাহিক কিস্তিতে প্রতি শুক্রবার দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় পাতায় 'জীবনে যা দেখলাম' শিরোনামে লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এ লেখার প্রেরণাদাতা ড. সৈয়দ আলী আহসানের তাগিদেই পুস্তকাকারে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হচ্ছে। বিট-পিয়নের অভাবে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক তাঁকে সংগ্রাম নিয়মিত পৌছাতে না পারায় আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, লেখা শেষ হলে কোন প্রকাশককে দেব।

কামিয়াব প্রকাশনের আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন আমার অনুমতি ছাড়াই প্রথম থেকে এ লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কম্পোজ করা শুরু করেছে বলে যখন তার কাছে জানলাম, তখন তাকে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করলাম।

পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যাপারে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট, ইবনে সিনা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, অধ্যয়ন পারদর্শী জনাব মুজিবুর রাহমান বাড়িতে এসে বলে গেলেন, 'এ বই সর্বপ্রথম আমি কিনব। আমার জানা অনেক কথা এমন চমৎকারভাবে পরিবেশন করায় আমি মুগ্ধ।' বললাম, 'আপনাকে তো প্রেজেন্ট করবো।' বললেন, তিনি তা নেবেন না, কিনেই নেবেন। প্রথম ক্রেতা হওয়ার দাবি জানিয়ে বিদায় নিলেন। এতে আমি অত্যন্ত প্রেরণাবোধ করলাম।

আমার জন্ম ১৯২২ সালে। এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। ৪৮ কিস্তিতে তা প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম দিয়ে পরিচ্ছেদ সাজানো সম্ভব নয় বলে কিস্তির নম্বরভিত্তিক পরিচ্ছেদেই সাজাতে হয়েছে। অবশ্য প্রতি কিস্তির লেখাতেই উপ-শিরোনাম রয়েছে এবং এর সূচিপত্রও দেওয়া হচ্ছে, যাতে পাঠক- পাঠিকাগণ সূচি থেকে বিষয় বাছাই করার সুযোগ নিতে পারেন।

আমার সেক্রেটারি নাজমুল হক অত্যন্ত মুখলিস নিরব কর্মী। আমার লেখার খসড়া পত্রিকায় পাঠাবার পূর্বে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যথা সময়ে সম্পাদকের নিকট পৌছাবার দায়িত্ব পালন করে সে আমাকে তার জন্য দোয়া করতে বাধ্য করেছে।

এ বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন-এর আন্তরিকতা ও আগ্রহ দেখে প্রকাশক হিসেবে তার ওপর আমার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সে নিজেই প্রুফ দেখেছে, এমনকি যোগ্যতার সাথে সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছে। প্রকাশক হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করুন এবং তার প্রকাশনার নামটা সার্থক করুন।

যে তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমি লিখছি আল্লাহ তাআলা তা পূরণ করুন, এ দোয়াই সবার কাছে চাই।

গোলাম আযম
ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২

অভিমত

জাতীয় অধ্যাপক

সৈয়দ আলী আহসান

অধ্যাপক গোলাম আযম আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি আমাদের দেশের রাজনীতিতে ছিলেন অনেক দিন। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞা এবং মনীষার প্রয়োজন হয় তা তাঁর মধ্যে বিশেষ পরিমাণেই ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের রাজনীতিতে বর্তমানে শিক্ষিত লোকের খুব অভাব। একসময় আমাদের দেশে যাঁরা রাজনীতিতে ছিলেন তাঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। গোলাম আযম সাহেব সেই ধারারই একজন। তিনি ঢাকা নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একই মাদ্রাসার কলেজ সেকশন থেকে আইএ পাশ করেন। তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেন। সুতরাং, ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী শিক্ষা এবং ইসলামী জীবন তিনি আয়ত্ব করেন। এভাবে একই সঙ্গে তিনি ইসলামী জীবন দর্শনের সঙ্গে ইংরেজি ভাবধারা এবং চিন্তায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দাবি-দাওয়া উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য লোকের সংখ্যা খুবই কম। জীবনে তিনি অনেক সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন এবং কারাবাসও করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সকল বিপদমুক্ত হয়ে স্বচ্ছ আলোতে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জীবন থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। তিনি একজন বাগ্মী, সুন্দর যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে পারেন এবং একজন নেতার যা গুণ সে গুণগুলো তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমি তাঁকে বহুদিন ধরে জানি। অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিনিময় হয়। সবসময় যে আমরা একমত হতে পারি তা নয়; কিন্তু মতের মিল না হলেও আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি। একসময় আমি তাঁকে বলেছিলাম তাঁর জীবন কাহিনী লিখতে, আমি খুবই খুশি হয়েছি যে, আমার কথায় তিনি এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়টি গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। এখানে যে ঘটনাগুলো বিকশিত হয়েছে তাতে তাঁর জীবনের প্রথম দিকটার কর্ম বিষয়ে আমরা জানতে পারি। পরে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলে তাঁর জীবনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমরা পেতে পারবো।

গোলাম আযমের ভাষা সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল। তিনি বাংলা ভাষার রীতি প্রকৃতির প্রতি সম্মান করে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁর এই বাংলা ভাষার মধ্যে অহেতুক অন্য কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার করেন না। এটি একটি বিশেষ গুণ। আমি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থও পড়েছি এবং আমি দেখেছি যে, সর্বক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় একটা সাবলীল গতি আছে। তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থকে তিনি একটি সার-সংক্ষেপ করেছেন। এটা খুবই সুন্দর হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ পুরোটাই অবশ্য বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু গোলাম আযম সাহেবের সংক্ষেপিত ভাষ্য সবার জন্য তৃপ্তিপ্রদ এবং সহজ।

তিনি যে রাজনীতি করেন, সে রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁর রাজনীতির পিছনে যে মানুষটি আছে তাঁর সঙ্গে আমার সখ্যতা আছে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের লোকেরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং রাজনীতি চর্চার ইতিহাস ধরতে পারবে।

সৈয়দ আলী আহসান
জুন, ২০০২

ড. কাজী দীন মুহম্মদ-এর মূল্যায়ন

অধ্যাপক গোলাম আযম প্রণীত প্রায় আড়াইশ পৃষ্ঠার স্মৃতিচারণমূলক আত্মজীবনী 'জীবনে যা দেখলাম'। লেখককে কেন্দ্র করে যে সমাজ বিবর্তিত হয়েছে গ্রন্থখানিতে তাঁর সবাক ছবি একের পর এক চলচ্চিত্রের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। পড়তে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছি, নস্টালজিক মোহময়তায় অভিভূত হয়েছি। বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ দেশের সমকালীন সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ইতিহাস সীমিত কলেবরে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের Sincerity of perpose তাঁর বক্তব্যকে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল করে তুলেছে। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের নিগূঢ় ভাবনাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অন্তরের কথাগুলো বাইরে এসে আপনা-আপনি জোড়া লেগে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত হয়েছে। তাঁর এককেন্দ্রিক অনুভূতি তাঁকে ঘিরে তাঁর কালের সমাজে সমগ্রতায় ব্যাপ্ত হয়ে এদেশ ও এদেশের মানুষকে অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে নীল আকাশের নিচে প্রতিস্থাপিত করেছে। সদ্য বিগত ঘটনাপুঞ্জের পর্দা উন্মোচন করে বাস্তবতার মঞ্চে দাঁড় করিয়েছে। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি বাস্তব ইতিহাসকে সাহিত্যরসে মণ্ডিত করেছে। ঘটনা পরম্পরায় গল্পের মত সম্মুখে টেনে নিয়ে যায়। কোথাও হোঁচট খায় না।

নানা কারণে স্বদেশে ও বিদেশে অধ্যাপক গোলাম আযমের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তিনি ১৯২২ সালে ঢাকায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলার নবীনগর থানার বীরগাঁও গ্রামের এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশবে গ্রামে ও কুমিল্লা শহরে কয়েকটি স্কুল ও মাদরাসায় পড়ে ১৯৪০ সালে ঢাকায় আসেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (প্রাক্তন ঢাকা মুহসিনীয়া মাদরাসা) থেকে বৃত্তি নিয়ে হাই মাদরাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ কলেজ থেকেই আইএ পাস করে ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৫০ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে এমএ পাস করেন। এ বছরেই তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। ইতোমধ্যে উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত হাদীয়ে দীন মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (র) প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাআতে যোগ দেন এবং বিভিন্ন তবকায় কাজ করে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় মর্যাদা লাভ করেন। এ সময় অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিসেও তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। আমাদের ৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। তিনি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকেই দেশ সেবার উপায় বলে মনে করেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ এলে তিনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সালে

জামায়াতে ইসলামী তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আমীর পদে অধিষ্ঠিত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে ২০০০ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সমাজ গঠনের সহায়ক। আর ধর্ম ও সংস্কৃতি তাকে লালন করে, পরিচর্যা করে, বিকাশ লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেকালে আমাদের দেশে চার পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল।

১. **সরকার পরিচালিত শিক্ষা:** এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ পেতো।

২. **কওমী মাদ্রাসা:** এটা সম্পূর্ণ বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজের সুযোগ পেতেন না।

৩. **আলীয়া মাদ্রাসা:** এ মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা আলীয়া পদ্ধতির মাদ্রাসায় শিক্ষকতা আর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সী ও উর্দুর শিক্ষকতা এবং বিবাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পেতেন।

৪. **নিউ স্কিম মাদ্রাসা:** এ মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মতো সর্বত্রই সুযোগ নিতে পারতেন।১

শিক্ষাব্যবস্থার এ বিশদ বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার কিরূপ সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর ইতিহাস তুলে ধরা। অধ্যাপক গোলাম আযম আইএ পর্যন্ত নিউ স্কিম মাদরাসায় শিক্ষিত হয়েছেন। এ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি ইংরেজি ও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা এবং তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ পান। এ পদ্ধতি চালু থাকলে আজকের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যে মানবতা ও ধর্মহীনতার শিক্ষা তরুণ সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে অবিসংবাদিত রেহাই পেতো। ধর্মের সঙ্গে কর্ম শিক্ষার সমন্বয় ঘটত। অধ্যাপক গোলাম আযম ঐতিহ্যবাহী ইসলামপন্থী পরিবারে কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছেন। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলাফেরা, সভা-সমিতিতে নিয়ম- কানুন ও সামাজিক শিষ্টাচার তিনি পারিবারিক সূত্রে শিক্ষা লাভ করেছেন। আর তাই তাঁর জীবনে চলার পথকে সুগম করে দিয়েছে।

তিনি লিখেছেন-

"আমার আব্বা যদি এ সব বিষয়ে কড়াকড়ি না করতেন তাহলে তার সন্তানদের মধ্যে দীনের প্রতি যেটুকু কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক শিক্ষার পরিবেশে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠার কোন ব্যবস্থাই নেই। এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যারা মুসলিম

চেতনা নিয়ে জীবন যাপনের চেষ্টা করছে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের পিতা-মাতার প্রভাবেই তারা শিক্ষালয়ের অধার্মিক পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।২

অধ্যাপক গোলাম আযমের জীবনে তাঁর দাদার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বলতে গেলে, তিনি তাঁর দাদারই মানস-সন্তান। দাদার বাস্তব শিক্ষা তাঁর জীবনের এতখানি দখল করে আছে- যে, তিনি তাঁর অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দাদার জীবিত নিঃশ্বাস উপলব্ধি করেন। তাছাড়া তাঁর আব্বা-আম্মা, নানা-মামার প্রভাবও তাঁর জীবনের অনেকাংশ দখল করে আছে। এছাড়া তিনি কৈশোরে ও যৌবনে যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা নুর মুহম্মদ আযমী, নেয়ামত পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম প্রমুখ তাঁর জীবনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা উজ্জীবনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে আছেন। তাবলীগ জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আযীয খুলনাভী এবং মাওলানা জিয়াউদ্দীন আলীগড়ীর (র) সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সাংবাদিকতায় মুসলিম বাংলার প্রাণপুরুষ মাওলানা আকরাম খানের স্নেহধন্য হবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। নেযামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতহার আলী (র)-এর প্রভাবও তাঁর জীবনে নগণ্য নয়। ইসলামী আন্দোলনের সূত্রে আরো বহু স্বনামধন্য আলেমের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। তাঁর জীবনে যাঁদের প্রভাব, বিশেষকরে জামায়াতে ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাওলানা মওদূদী (র)-এর প্রভাব অবিস্মরণীয়; এঁদের অনেকের কথা তিনি বিস্তারিত বলেছেন।

তাবলীগ জামায়াত, তমদ্দুন মজলিস ও জামায়াতে ইসলামী সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। বস্তুত এ তিনটি সংস্থাকে তিনি মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরেছেন এবং ঈমান ও আকীদা নিয়ে এ তিনের মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের জীবনের কর্মপ্রেরণা ও প্রোষিত বাসনার স্ফূর্তি বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছেন।

তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচি যে অশিক্ষিত ও সামান্য শিক্ষিতের জন্য খুবই উপযোগী, এ কথা তিনি তাঁর বিশ্বাস ও কর্মে প্রমাণিত করেছেন। মুসলিম জিন্দেগী ও ইসলাম যে আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত, বিপন্ন এবং এ অবস্থার আশু নিরসন হওয়া যে একান্ত অপরিহার্য এ কথা তাঁর কথায় ও কাজে অনুদিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি এ তিন সংস্থার কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-

"আমি তো তাবলীগে ধর্মীয় দিক এবং তমদ্দুনে রাজনৈতিক দিক পেয়ে সন্তুষ্টই ছিলাম, কিন্তু যখন জামায়াতে ইসলামীতে একই সাথে ইসলামের সবটুকু পাওয়া যাচ্ছে বলে অনুভব করলাম, তখন তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের বদলে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমেই ইসলামের সকল দিকের দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।"৩

"আমি যেভাবে তাবলীগ জামায়াতে মনেপ্রাণে ডুবে ছিলাম তাতে মনে হয় যে, তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত না পেলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের মানসিকতা সৃষ্টি হতো কিনা জানি না। তিন বছর তমদ্দুন মজলিসে যা পেয়েছি এর বিবরণ পরবর্তী আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ। জামায়াতে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে আসার পথে তমদ্দুন মজলিসের অবদানকে আমি অকপটে স্বীকার করি। তাই আমার দ্বীনী জিন্দেগী গড়ার পথে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের নিকট আমি চিরঋণী। তাবলীগ জামায়াত আমাকে মিশনারি জযবা দান করেছে। আর তমদ্দুন মজলিস ইসলামকে সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন হিসেবে ধারণা দিয়েছে।"৪

প্রকৃত প্রস্তাবে এ তিন সংস্থার মূল বক্তব্য ও উদ্দেশ্য পেশ করার মাধ্যমে তিনি ইসলামকে তুলে ধরেছেন। ইসলামই যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এ তথ্য এ গ্রন্থখানাকে আলাদা মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এতে আরো রয়েছে এদেশের ইতিহাস, মুসলিম জাতির আগমন ও প্রসার, রাজনীতি, ধর্মনীতির ক্ষেত্রে মুসলিমের অংশগ্রহণ, রাজ্যের পটপরিবর্তন, চার পতাকার শাসনামল-ব্রিটিশপূর্ব আমল, ব্রিটিশ আমল, ব্রিটিশের অধীনতা মুক্ত পাকিস্তানি আমল এবং আরো পরে স্বাধীন বাংলাদেশ আমল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও মতামত। আরো সমাবেশ ঘটেছে বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, দুর্ভিক্ষ, কোলকাতা ও ঢাকায় বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ইতিহাস এবং মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মনৈতিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় বহুমাত্রিক আলোচনা। ১৭৫৭-এর পরাজয় ও নিপীড়িত রাজ্যচ্যুত মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশা, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব, দু'শো বছরের গোলামির শিকলে বন্দিদশা, মুসলমানদের রাজনীতিতে প্রবেশ, মুসলিম লীগের অভ্যুদয়, পাকিস্তান আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোল ও মন্বন্তরের কড়াল গ্রাস এবং স্বদেশী আন্দোলন, ঢাকা ও কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা এবং হিন্দু সমাজের মুসলিম বিদ্বেষ ও নির্যাতন এবং হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য, দেশবিভাগ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক বিপ্লব এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এ সবই 'জীবনে যা দেখলাম' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ধর্ম ও সংস্কৃতি গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞানী, সকলের জন্য রয়েছে প্রচুর উপাত্ত। আমাদের অতীত ইতিহাস বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করার এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য এ গ্রন্থের মতামত পর্যালোচনা অপরিহার্য। মানুষকে ধার্মিক হওয়ার জন্য, প্রকৃত মানুষ তথা মুসলিম হওয়ার জন্য পুস্তকখানি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে।

আত্মজীবনী লেখার কৈফিয়ত দান প্রসঙ্গে অধ্যাপক গোলাম আযম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

১. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তির মধ্যে যারা আমাকে মহব্বত করেন, তারা এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য হয়তো এ থেকে কিছু শিক্ষা বা উপদেশ সংগ্রহ করতে পারেন।

২. জীবনে যা কিছু দেখলাম তা প্রকাশ করা উপলক্ষে এর পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত এমন কিছু শিক্ষামূলক ঘটনা ও উপদেশমূলক বিবরণ পেশ করার সুযোগ পাবো, যা থেকে তারা উপকৃত হতে পারেন।

৩. আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর দীনের যেটুকু আলো দান করেছেন, তা থেকে যতটুকু সম্ভব এ উপলক্ষে পরিবেশন করা সহজ হবে।

অধ্যাপক গোলাম আযম রাজনীতিতে ধ্রুব নক্ষত্রের মত হঠাৎ উদিত না হলেও তিনি ধীরে ধীরে চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে যথা স্থানে পৌছে যান। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসার কারণে স্বভাবতই তাঁর শত্রুপক্ষ সৃষ্টি হয়। বিশেষকরে ইসলাম ও তওহীদবাদ বিরোধীদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং বিরুদ্ধপক্ষ তাঁকে অবাঙ্গালি আখ্যা দিয়ে তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার, কংগ্রেসপন্থী মুসলিমদের প্রতি পাকিস্তান বাস্তবায়িত হওয়ার পরেও এ ধরনের আচরণ অবিদ্যমান ছিল। পাকিস্তানে থেকে যারা পাকিস্তানের 'সর' খেয়েছেন তাঁদেরই অনেকে পাক-বিরোধী ভারতপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও অনুরূপ আচরণ লক্ষণীয়। এ স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারে অধ্যাপক গোলাম আযমের পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ করেছে। তাঁর আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ সকলের মনে আস্থার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি হীন সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমরা জাতি হিসেবে নিদারুণভাবে ইতিহাস অবচেতন! আমাদের মধ্যে অনেকেই তার নিজের, তার পিতার এবং তার পিতামহের বড়জোড় তার প্রপিতামহের নাম ছাড়া চতুর্থ পূর্ব-পুরুষের নামটি সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমরা কোথেকে এলাম, পশ্চাত পটভূমি কী, কিছুই জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এ কারণেই যখন তথাকথিত 'পণ্ডিতম্মন্য কুলীনরা' বাংলাদেশী সব মুসলমানকেই তফসীল শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর অনার্য হিন্দু শ্রেণীর বংশজাত বলে উল্লেখ করে এ জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য ও রক্তধারা নিয়ে বিদ্রুপ করে, তখন বিনা প্রতিবাদে আমরা সকলেই তা মেনে নেই এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা হযম করি। কেউ প্রতিবাদ করার মতো পাণ্ডিত্য বা সাহস দেখানোর প্রয়াস পাই না। পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশ করা তো দূরের কথা স্বীয় ইতিহাস জানতেও ভয় পাই। আমার পিতা বা দাদার নাম যদি 'কুড়াইল্যা' বা 'পাপোছা' হয় তাহলে কিভাবে পরিচয় দিবো? তার চাইতে না জানাই অনেক ভালো। কোন রকমে মনের মধ্যে বাপের বিরুদ্ধে আক্রোশ দমন করে মনে মনে বলি, বাপটা কেমন অসভ্য মানুষ, তার পিতার নামটাও ঠিক করে রাখতে পারেনি। অবশেষে 'শেখ কুড়ালি মিয়া' নাম দিয়ে বাপের ও নিজের মান রাখি। সেদিক থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তিনি তার পিতা ও তার পিতার পিতা অর্থাৎ দাদাকে জীবিত পেয়েছেন, সাহচর্য লাভ করেছেন। পিতামহের কাছ থেকে তাঁর

পিতার ও পিতামহের পরিচয় জেনেছেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্ববর্তী চার পুরুষ- দাদার দাদা, দাদার পিতা, দাদা ও পিতা এবং তিনি নিজে আর দুই উত্তর পুরুষ- তার পুত্র ও তার নাতী-একুনে সাত পুরুষের ইতিহাস ঐতিহ্য ও রক্তের সাথে সুস্পষ্ট সম্বন্ধ এবং তাহযীব তামদ্দুনের সিলসিলা বিদ্যমান। আর তাঁর নানার দিক থেকে রক্তধারা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই এদিক থেকে ইসলাম ও মুসলিম রক্ত এবং ঐতিহ্যের গোড়া শক্ত বলে তিনি সদর্পে দাবি করতে পারেন। এ সাত পুরুষের ইতিহাস তাঁর কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। এদিক থেকে বিচার করলে অন্তত দু'শ বছর আগে এদেশের তার পূর্ব-পুরুষের আগমন ঘটেছে বলে সাক্ষ্য দেওয়া যায়।

অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রন্থমধ্যে বার বার বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি পণ্ডিত নন, সাহিত্যিক নন; কিন্তু তাঁর রচনা যে সাহিত্য হয়েছে, এতে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। তিনি কবি নন; কিন্তু মনের গভীরে লালিত কাব্যময়তা না থাকলে নিছক বাস্তবকে এমন সরস, সতেজ করে বলার, সহৃদয় হৃদয়বেদ্য করে তোলার কাব্যগুণ থাকতে পারে না। তিনি যে ঘটনা বা দৃশ্য যেভাবে দেখেছেন, সেভাবেই, যা দেখেছেন তা-ই ভাষায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। বলা চলে, The best word in the best form. বাহ্য বস্তু নিজের করে নিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সর্বজনীন ভাষায় এ রূপদান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই কর্ম। ঐতিহাসিক সত্য (Historical truth)-ও সত্য যে বর্ণনাগুণে এমন কাব্যসত্য (Poetic truth) হয়ে উঠতে পারে, পাঠক তার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁর বক্তব্যের পরতে পরতে।

লেখক যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি নিজের অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন।- দৃশ্যমনে বাহ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দকে আত্মগত অনুভূতির রসে সিক্ত করে প্রকাশ করেন। নিজের কথা, বাহ্য জগতের কথা, পরের কথা শিল্পীর মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কৃত হয়, তার শিল্পসঙ্গত প্রকাশই যদি সাহিত্য হয়, তবে অধ্যাপক গোলাম আযমের 'জীবনে যা দেখলাম' জ্বলজ্যান্ত ইতিহাস হয়েও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। A piece of Art হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষা ভাবের অনুগ, শব্দ চয়ন বিষয়ানুগ, বিশেষকরে কবিত্ববিলাস বিবর্জিত সরল-সহজ কথার মালা পাঠকের অজান্তেই অন্তরের অনুভূতি আকর্ষণে সমর্থ। রঙহীন বিচিত্র দৃশ্যাবলি রঙিন তুলিকার আঁচড়ে নয়; রঙহীন সাদামাঠা তুলিকার আঁচড়ে স্পষ্টতর হয়ে ফুঠে উঠেছে। বিবর্ণ নয়; রঙের ঔজ্জ্বল্যও নয়; বরং স্বাভাবিক বর্ণ-বিক্ষেপে সাধারণ চিত্র হয়ে উঠেছে অসাধারণ। ভাষায় যেমন আড়ষ্টতা নেই, তেমনি নেই অশুদ্ধি। প্রকৃতি, মন ও প্রকাশ যখন একই সমতলে অবস্থান করে তখনই তা হয় সার্থক সৃষ্টি।

লেখকের রসবোধ প্রশংসার্হ। ধারা বিবরণীর মত বর্ণনা দেওয়ার মাঝে মাঝে হাস্যরসের চুটকি পরিবেশন করতেও ভুল করেননি।

তিনি যখন কলেজে পড়েন, সে সময়ের ঘটনা। তিনি হোস্টেলের ডাক্তারকে বললেন ঘুম তাড়ানোর ঔষধ দিতে। ডাক্তার কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বেটা ঘুম কমাবার ঔষধ চাও, ডাক্তাররা কোনদিন ঘুম কমাবার ঔষধ দেয় না। দিলে ঘুমের ঔষধই দেয়। আজ তুমি ঘুম কমাবার ঔষধ চাচ্ছ, একদিন আসবে যখন ডাক্তারের কাছে ঘুমাবার ঔষধ চাইবে।৫

মনে হয়, তিনি তাঁর জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। সেখানে পরীক্ষার আগের দিন চা খেয়ে সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে কিভাবে পরের দিন পরীক্ষার হলে বার বার সামনের ডেস্কে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং হাত থেকে কলম পড়ে গিয়েছে আর ইনভিজিলেটর বার বার তা তুলে দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে যে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে তা তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৯৩৮-৩৯ সালের কথা। কোলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান এ দু'দলের খেলার খবর রেডিওতে শোনার জন্য আমরা দল বেঁধে এক ইংরেজ জমিদার বাড়িতে যেতাম। সে জমিদার খুবই শৌখিন লোক ছিলো। তার এক অদ্ভুত হবি ছিলো। কুমিল্লার আদালতপাড়ার বড় রাস্তার পাশেই ঐ জমিদারের বিরাট বাড়ি ছিলো এবং তার বাড়ি বরাবর রাস্তায় বিরাট বিরাট গাছ ছিলো। বিকাল বেলায় রাস্তায় ও আশেপাশে বিচরণরত দশ-পনের বছর বয়সের ছেলেদেরকে ডেকে কিছু টাকা দিয়ে গাছে চড়তে বলতো। গাছে উঠার পর তাদেরকে তাদের যত রকম গালি জানা আছে চিৎকার করে সে সব গালি উচ্চারণ করার জন্য উৎসাহ দিতো। এতোগুলো ছেলে গালি দিতো আর নিচে সে হাততালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগতম জানাত। নিচে নামার পর তাদেরকে আবার টাকা দিতো। সে অদ্ভুত তামাশা দেখার জন্য বহু লোক জড়ো হয়ে যেতো। আমি জানি না এমন অদ্ভুত সখ দুনিয়ার আর কোন লোকের আছে কিনা।৬

এক সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও কাজী মুতাহার হোসেনকে আনার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। সেকালে ঘোড়ার গাড়িই একমাত্র যানবাহন ছিলো। দু'জনকে একই গাড়িতে করে সম্মেলনে নিয়ে আসার পথে তাদের যে রসাত্মক বক্তব্য শুনলাম তা এখনও মনে আছে। কাজী সাহেব অধ্যক্ষ সাহেবের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "আপনি একটা কথাকে বুঝাতে গিয়ে যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেন তা অত্যন্ত উপাদেয়। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে লিখায় অভ্যস্ত। তাই আমার পাঠক তৃপ্ত হয় কিনা জানি না।" অধ্যক্ষ সাহেব বললেন, "আপনারা বিজ্ঞানের মানুষ। ভিটামিন টেবলেট দিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের পেট ভরে ডালভাত না খেলে তৃপ্তি হয় না।"

একবার পত্রিকায় খবর বের হলো যে, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। দেখতে গেলাম। তাঁর প্রশান্ত মুখে সব সময়ই সুন্দর হাসি দেখে আমি অভ্যস্ত। সালাম দিলাম। ঐ সুন্দর হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন।